জাতীয় বাজেট ২০০৯-১০ পর্যালোচনা

কৃষি, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও জনসেবা খাত

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

ভূমিকা:

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) স্থানীয় এনজিও এবং নাগরিক সংগঠনের একটি জোট যা দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্রবান্ধব বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেটে কৃষক, শ্রমিক, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলনের জন্য প্রচারাভিযান করে আসছে। আগামী অর্থ বছরের (২০০৯-২০১০) বাজেটকে সামনে রেখে সুপ্র গত ২ মে, ২০০৯ ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে এবং ৪৬ জেলায় প্রাক-বাজেট আলোচনার আয়োজন করেছিল। আলোচনা সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত, দাবি ও সুপারিশ ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেট নিয়েও সুপ্র ৪৬ জেলায় বাজেট পর্যালোচনা সভা ও ছয়টি অঞ্চলে আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভা আয়োজন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। বাজেট প্রনয়নের পূর্বে সুপ্র'র দাবি ও সুপারিশ আগামী অর্থ বছরের বাজেটে কি রূপে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বর্তমান ঘোষিত বাজেটকে কীভাবে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও দাবী পূরণে সক্ষম একটি দরিদ্র অনুকূল বাজেটে পরিণত করা যায় সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজকের এই জাতীয় বাজেট ২০০৯-১০ পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী অর্থ বছরকে সামনে রেখে দেশের মানুষের ব্যাপক প্রত্যাশা, সময়ের বাস্তবতা ও চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বিশাল বাজেট (১,১৩,৮১৯ কোটি টাকা) প্রণীত হলেও জনকল্যাণধর্মী রাষ্ট্র[1] তৈরির লক্ষ্যে ঘোষিত বাজেটের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। এবারের বাজেটের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নামক খাতে হাসপাতাল ও স্কুলসহ অন্যান্য জনসেবাখাতগুলোকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে এসে বেসরকারি উদ্যোগের কাছে তা সমর্পণ করার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সুপ্র মনে করে যে, মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মত মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো সরবরাহ ও নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের সংবিধানে জনসেবাখাতগুলোতে ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যতীত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানি এসবের দায়িত্ব নিলে স্বাভাবিকভাবেই এতে সকল জনসাধারণের সমান অভিগম্যতা থাকবে না। এবারের বাজেটের আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, সরকার অপ্রদর্শিত আয়ের উপর মাত্র ১০% কর প্রদান সাপেক্ষে তা বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে । এ বিষয়ে সরকার রাজনৈতিক কারণে আপোষ করলেও আমরা মনে করি, এ ক্ষেত্রে সরকার নৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে। এ কারণে, বৈধ উপায়ে করপ্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হবেন ও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দীর্ঘমেয়াদে করনীতিকে দুর্বল করে দিবে। এছাড়া তিন বছরের মধ্যে কালো টাকা সাদা করার যে অশুভ উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে তা অবৈধ আয় ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার শামিল। তবুও আশার কথা এই যে, এ বারে সরকার দাতাদের আরোপিত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র-২ এর পরিবর্তে স্বাধীনভাবে পঞ্চবার্ষিক ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ রকম একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-কৌশলের জন্য সুপ্র সহ অন্যান্য নাগরিক জোট দীর্ঘদিন ধরে প্রচারাভিযান করে আসছে। আগামীতে এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক সুশাসন দেশের উন্নয়নে সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে ।

১. বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ

এ বছর বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী অংশীদারিত্বমূলক জেলা বাজেট প্রণয়নের কথা আগামী বাজেটে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হবে। এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই । সুপ্র দীর্ঘ দিন ধরে ধারাবাহিক আমলাতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সংস্কারের জন্য প্রচারাভিযান করে আসছে কেননা বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ও বাজেট সম্পর্কিত তথ্যে কৃষক, শ্রমিক, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। আগামীতে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ি গণপ্রতিনিধিত্বশীল বাজেট প্রণীত হলে তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে। এখানে আরও উল্লেখ্য, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে কোনো প্রকারের মতামত ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় না। এ জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের চাহিদা ও পরামর্শের আলোকে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং তদারকিসহ ফলাফল লাভ ও মূল্যায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

২. ঘাটতি বাজেট, বৈদেশিক ঋণ ও করকাঠামো সংস্কার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন কোন শর্তযুক্ত ঋণ বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না। আমরা আশা করি, উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে এর প্রতিফলন ঘটবে । কিন্তু সমস্যা হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শর্তযুক্ত নমনীয় বৈদেশিক ঋণকে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে দেখানো হয় । গত এক দশকের মধ্যে এবারের বাজেট ঘাটতি সবচেয়ে (৩৪,৩৫৮ কোটি) বেশি যা দেশী-বিদেশী ঋণের মাধ্যমে মেটানো হবে ; অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২০,৫৫৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক খাত থেকে ৮,৬৭৩ কোটি টাকা। বাড়তি এই ঋণের বোঝা আগামী অর্থবছরগুলোতে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে এবং সেবা খাতের বরাদ্দকে সংকুচিত করবে। আগামী অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সুদ পরিশোধ খাতে অর্থাৎ ১৩.৯% যা শিক্ষা বাজেটের (১২.৬%) থেকেও বেশি। এ জন্য সরকারকে দেশী-বিদেশী ঋণের সুদের

[1] ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, ১৩ জুন ২০০৯ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য

জন্য ১৫,৮০৮ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে যা সংশোধিত বাজেটের (২০০৮-০৯) থেকে ২,৪৯৪ কোটি টাকা বেশি । বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় নতুন ঋণ করার প্রবণতা থেকে সরে এসে ইতোমধ্যে গৃহীত বিদেশী ঋণ বাতিলের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে । প্রতিবছর বাংলাদেশকে বৈদেশিক দেনা শোধে ব্যয় করতে হয় গড়ে ১০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার[২] যে অর্থ সরকার জনসেবা খাতে ব্যয় করতে পারতো। দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি, করের আওতা বৃদ্ধির জন্য কর কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। কর দাতাদের উৎসাহিত করার জন্য প্রচারাভিযান চালানো এবং কর প্রশাসনকে করদাতাবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন

বিগত বছরগুলোর বাজেট বাস্তবায়নের হার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরকার ঘোষিত এডিপির পূর্ণ বাস্তবায়ন নির্দিষ্ট অর্থবছরে কখনোই সম্ভব হয়নি। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এডিপির পরিমাণ ছিলো ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং বছর শেষে এর ৮২ শতাংশ বাস্তবায়িত হলেও জুলাই-মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় মাত্র ৩২.৩ শতাংশ[৩]। একইভাবে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এডিপির পরিমাণ ছিলো ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে করা হয় ২৩ হাজার কোটি টাকা। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুলাই '০৮-এপ্রিল '০৯ পর্যন্ত ব্যয় হয় এডিপির ৪৬ শতাংশ[৪]। বিগত বছরগুলোতে এডিপি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভূক্ত না করা, সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। ২০০৯-১০ সালের বাজেটে এডিপির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের এডিপির চেয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা (১৯ শতাংশ) এবং সংশোধিত এডিপির চেয়ে ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (৩৩ শতাংশ) বেশি। । এ বছর এডিপি বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে স্থানীয় সম্পদের (স্থানীয় মুদ্রা) পরিমাণ ১৭ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা (৫৮ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্যের (বৈদেশিক সাহায্য) পরিমাণ ১২ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা (৪২ শতাংশ)[৫]। এডিপির পূর্ণ এবং মানসম্মত বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন, স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকারের সাথে সাংসদদের কাজের সমন্বয়, কাজের বন্টন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি মনিটরিং জোরদার এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সহ নানামুখী কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামী ২০১২ সালের মধ্যে সরকার খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জন করার অঙ্গীকার করেছে। সুপ্র কৃষিখাতে অধিকতর বাজেট বরাদ্দ ও কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণা চালিয়ে আসছে এবং ৪৬ জেলায় অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনা হতেও কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, সঠিক সময়ে কৃষকের কাছে ভালো বীজ ও প্রযুক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা, ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার হ্রাস করা, কৃষি ঋণ সহজ করা, কৃষি বীমা চালু করা, ভূমি সংস্কার ইত্যাদ্যি সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার ২০০৯-১০ বাজেটে কিছু কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে যা প্রশংসার দাবী রাখে। যেমন, লবণাক্ততার ঝুঁকি প্রতিরোধ, কৃষিঋণ বিতরণ, পার্বত্য জেলাগুলোতে বিশেষ রেয়াতিহারে ঋণ প্রদান কার্যক্রম, বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও ৩৩৩টি খাদ্যগুদাম নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এগুলো সবই কার্যকরী পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি ।

অর্থবছর	মোট বাজেট	কৃষিখাত		কৃষি ভতুর্কি	
		মোট বরাদ্দ	%	মোট বরাদ্দ	%
২০০৯-১০	১১৩,৮১৯	৮,৯৬৩	৭.৯	৩৬০০	৩.১৬
২০০৮-০৯ (সংশোধিত)	৯৪,১৪০	১০,৪২৮	১০.৬	৫,৭৮৫	৬.১৪
২০০৭-০৮ (সংশোধিত)	৮৬,০৮৫	৮,৬৯০	১০	৫,৯২৯	৬.৯
২০০৭-০৮	৭৯,৬১৪	৬,৮৯১	৮.৬	৪,২০০	৫.২
২০০৬-০৭	৬৯,৭৩৬	৫,৮০৫	৮.৩	১,৭২৬	২.৪
২০০৬-০৭ (সংশোধিত)	৬৬,৮৩৬	৫,৩১৬	৭.৯	৩,১৭২	৪.৭

খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঘোষণা সত্ত্বেও এ বছর কৃষিখাতে বাজেট কমানো হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১০,৪২৮ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১০.৬ শতাংশ, এ বছর এটা কমে হয়েছে ৮,৯৬৩ কোটি যা মোট বাজেটের ৭.৯ শতাংশ। ২০০৮-০৯ এ ভতুকি ছিল ৫,৭৮৫ কোটি যা মোট বাজেটের ৬.১৪ শতাংশ, এ বছর এটা কমে হয়েছে ৩৬০০ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৩.১৬ শতাংশ। চলতি বছরে ধান চাষে কৃষকেরা পুঁজি উঠাতে পারেনি এবং ধান-চালের মুনাফার একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীদের পকেটে। বাজারে মানসম্মত বীজ নেই। ভেজাল সার কিনে কৃষক প্রতারিত হচ্ছে। বীমা কোম্পানীগুলোতে কৃষি বীমার কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। কৃষিপণ্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত হিমাগারের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া প্রতি বছর ৬৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে এ ব্যাপারেও কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য বাজেটে নেই। আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও চলতি বছর ২০০৮-০৯ বাজেটে কৃষিতে যেটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল তার সঠিক ব্যবহার

---

2 Monower Mostafa, External Debt, MDGs & Essential Services in Bangladesh, June 2008
3 Ministry of finance, Cumulative ADP Expenditure, July 2008-March 2009
4 CPD Post Budget Press Conference Paper , 12 June, 2009
5 Bdnews24.com, 27 May 2009

করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আগামি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য সুপ্রর সুপারিশ ও দাবী হচ্ছে, কৃষি জমি অকৃষি খাতে স্থানান্তর রোধ করা, ভূমি সংস্কার ও ভূমিতে প্রকৃত কৃষক তথা বর্গা চাষীর অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কৃষি উপকরণের (সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল ও সেচ যন্ত্রাংশ) সহজলভ্যতা ও প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে এবং মিল মালিকদের জিম্মিদশা[৬] থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে হবে । পাট শিল্পের জাগরণ ও এর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বাজেটে এর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার, কর্ম পরিকল্পনা ও বরাদ্দ রাখতে হবে ।

৫. সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও বৈষম্যহীন, গণমুখী ও সর্বজনীন[৭] হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষার অভাব, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঝরে পড়া হারের উর্ধ্বগামীতা, গ্রাম ও শহরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, শিক্ষার পণ্যায়ন, বেসরকারিকরণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২.৬% যা বিগত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের (১৩.৩%) তুলনায় শতকরা হারে কম ।

অর্থবছর	মোট বাজেট	শিক্ষা	%
২০০৯-১০	১,১৩,৮১৯	১৪,৪০৭	১২.৬
২০০৮-০৯ (সংশোধিত)	৯৪,১৪০	১২,৫৪৯	১৩.৩
২০০৮-০৯	৯৯,৯৬২	১২,২৫৮	১২.৩
২০০৭-০৮ (সংশোধিত)	৮৬০৮৫	১১,৬৫৪	১৩.৫
২০০৭-০৮	৭৯,৬১৪	১২,৩৬৯	১৫.৫
২০০৬-০৭	৬৯,৭৩৬	১১,০৯৪	১৫.৯

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ শতাংশ নতুন বই সরবরাহ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপন, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ এ নামিয়ে আনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরকার যেখানে ঋণ এর সুদ পরিশোধে বরাদ্দ রেখেছে ১৩.৯ শতাংশ সেখানে গতানুগতিক ধারাবাহিকতায় শিক্ষাখাতে এর থেকেও বরাদ্দ কম অর্থাৎ ১২.৬ শতাংশ। এ জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বাজেট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবারের বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ জনসেবাখাতকে পিপিপি'র আওতাভূক্ত করা। এ ক্ষেত্রে সুপ্রর অবস্থান হচ্ছে, শিক্ষার মতো সেবা খাতগুলোকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে না হলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অবারিত হবে না । আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী জানাচ্ছি কারণ শিক্ষাকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দিলে শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমান অভিগম্যতা সীমিত হয়ে আসবে। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশই গ্রামে পড়ালেখা করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের অর্থ যাতে গ্রামাঞ্চলে সঠিক ভাবে পৌঁছায় সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে । একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৬. ২০২০ সাল: সকলের জন্য স্বাস্থ্য

স্বাস্থসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল ৬,০৯২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫.৯% এবং পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে যা দাড়ায় ৬, ১৯৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.২% । এবারের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে ৬, ৯৮০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.১% এবং গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১% কম।

অর্থবছর	মোট বাজেট	স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ	%	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ		
				উন্নয়ন	অনুন্নোয়ন	মোট
২০০৯-২০১০	১,১৩,৮১৯	৬,৯৮০	৬.১	৩০৭৫	৩৯০৫	৬,৯৮০
২০০৮-০৯ (সংশোধিত)	৯৪,১৪০	৬,১৯৬	৬.২	২,৬১৫	৩,৫৮১	৬,১৯৬
২০০৮-০৯	৯৯,৯৬২	৬,০৯২	৫.৯	২,৪৩৯	৩,৬৫৩	৬,০৯২
২০০৭-০৮ (সংশোধিত)	৮৬,০৮৫	৫,২৬১	৬.১	২,৮৯৮	২,৩৬৩	৫,২৬১
২০০৭-০৮	৭৯,৬১৪	৫,৪৭০	৬.৮	২,৬০৬	২,৮৬৪	৫,৪৭০

এবারের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতকেও পিপিপি'র আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারীকরণ ও বানিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা সীমিত হয়ে আসবে এবং ঔষধের মূল্য নির্ধারণে কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রাইভেট ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রমরমা ব্যবসা আরো বেশি প্রসারিত হবে। তবে, গণমানুষের কিছু দাবীর প্রতিফলন এ বাজেটে রয়েছে যেমন, ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি করে মোট ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, গর্ভবতী মা ও শিশুর মৃত্যু রোধে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি, প্রজনন নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচি, উপজেলার হাসপাতালকে ৫০ ও জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য

[৬] ড.মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বাজেট: একটি গঠনমূলক পর্যালোচনা, দৈনিক যুগান্তর, ১৫ জুন, ২০০৯

[৭] ড: আতিউর রহমান, উন্নয়নে শিক্ষা; বাংলাদেশের অবস্থান, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিআইডিএস নভেম্বর ২০০৮

স্বাস্থ্যখাতকে পিপিপি'র আওতামুক্ত রাখা, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে সকল শুণ্যপদে অবিলম্বে ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া এবং সরকারি মনিটরিং ও নজরদারি বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সেবা প্রদানে গুণগতমান নিশ্চিত করে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকি নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি ।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে ৯,২১১ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৮% ও জিডিপির ২.৫%) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দু:স্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উপকারভোগীর সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে যা গ্রামীণ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনসাধারণকে রক্ষার জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দারিদ্র নিরসনের কোন স্থায়ী সমাধান নয় । দারিদ্র্য নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ চিহ্নিত করে আয় বৈষম্য দূরীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে । এ খাতে শুধু বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোই সামজিক দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে না এর জন্য প্রয়োজন সর্ব প্রকার দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয় রোধে উপযুক্ত মনিটরিং জোরদার করা। বিগত অর্থ বছরের ১০০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পে নানা রকমের স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমানে তা স্থগিত করা হয়েছে। আগামি অর্থ বছরে গ্রামীণ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি খাতের বাজেট সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন, অঞ্চলভিত্তিক প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ন্যায্য মজুরি প্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে[৮] সরকারের পাশাপাশি এনজিওদেরকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে ।

৮. নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

বর্তমান বাজেটে সংবিধানের ১০ ও ২৮ ধারার আলোকে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান মযার্দা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে। আমরা চাই নারী উন্নয়ন কেবল বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নারীদের অধিকারের ভিত্তিতে তার প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত হোক। কারণ ভাতা দেয়া একটা চ্যারিটি এপ্রোচ। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে একজন নারী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই সে মাতৃত্বকালীন সেবা ও বয়সকালীন ভাতা পাওয়া তার অধিকার। এই সেবাগুলোকে ভাতা হিসেবে না দেখে নারীর অধিকার হিসেবে দেখতে হবে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় আরও বলেছেন, সংসদে নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হবে যারা সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কেবল আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা যাবে না। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এটা কেবল নারী সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেই নয় স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সকল নারী প্রতিনিধিদের জন্যই একথা প্রযোজ্য। এছাড়া বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ ও কারিগরী সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো খুবই ভাল উদ্যোগ কিন্তু নারীদের এর প্রকৃত সুবিধা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

আগামি অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪ হাজার ৩১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ৩.৮ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ ছিল ২, ৯০৯ কোটি টাকা। বাজেটে নতুন অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা না থাকলেও চারবছর মেয়াদি পরিকল্পনা ও ২০১৩ সালের মধ্যে পাচঁ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ি ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। এবারের বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন বাজেট পিপিপি'র আওতায় নেয়া হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, সেবাখাতগুলো ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিলে দরিদ্র মানুষ সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। সুপ্র নীতিগতভাবে সেবা খাতগুলোর সকল প্রকার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং এ ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব বলে মনে করে। আগামী বাজেটে বিদ্যুতের বিকল্প উৎস হিসেবে সৌর বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় সৌর প্যানেল আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন, সরবরাহ পর্যায় ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি আমদানির উপর থেকে ভ্যাট তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা খুবই ভাল উদ্যোগ। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দেশে প্রায় ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সরকারি প্রণোদনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এটাকে শহরাঞ্চলেও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

একটি দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা হল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এবারের বাজেটে (২০০৯-২০১০) সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পিপিপি'র ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও এর মনিটরিং সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পরিবহণ ও যোগাযোগখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৭,৪৩৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.৫%। তবে বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় পরে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে যা ছিল সুপ্রর দীর্ঘদিনের দাবী। রেল যোগাযোগকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা এবং এর হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পিপিপি'র আওতায় নিয়ে আসলে দরিদ্র মানুষের

---

[৮] সিপিডি কনফারেন্স পেপার "বাংলাদেশের ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী" ২৮-২৯ মার্চ ২০০৯

পরিবহণ রেল ও নৌপথে যাতায়াত সীমিত হয়ে আসবে। এ জন্য সরকারকে সারাদেশে সাশ্রয়ী, টেকসই এবং নিরাপদ পরিবহণ গড়ে তোলার জন্য দেশীয় মেধা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১০. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা

এ বারের বাজেট ঘোষণায় বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ২ কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হবে। জলবায়ু পরির্বতন মোকাবেলায় সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ জন্য মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাপান সরকার আগামী ৩ বছরে ৪৯০ কোটি টাকা সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব করেছে এবং ঋণের সুদ হিসেবে অর্জিত ৭০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দাবী হচ্ছে, দেশীয় নীতি কৌশলের মাধ্যমে পরিবেশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে ।

সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে এ বছর (২০০৯-১০) বরাদ্দ দিয়েছে ২৭৮ কোটি টাকা যা গতবারের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৮ কোটি টাকা বেশি। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ৬৫০ কোটি টাকার যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে সঠিকভাবে তার বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল এবং এ্যাকশন প্লান কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এই অর্থ কিভাবে ব্যয় হবে বা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এ জন্য দ্রুত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা না গেলে দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া, পরিবেশ দূষণ রোধ, নদী ও জলাশয়সমূহকে রক্ষা করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে । জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উন্নত দেশের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় ও বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে কাজ করতে হবে ।

উপসংহারঃ

চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদ্যুতের ভয়াবহ সংকট, শ্লথ রপ্তানি খাত ও বৈদেশিক সহায়তার অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে আগামি অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন খুবই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের কী করণীয় তার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা বাজেটে নেই । বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ও চরম দরিদ্রের হার ২৫% ও ১৫% এ কমিয়ে আনা, ২০১৩ সালের মধ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছে। আমরা এসব অঙ্গীকারের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি। সেই সাথে জনসেবাখাতসমূহে দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনসেবা খাতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য কর কাঠামো সংস্কার, বিদেশী দাতা সংস্থার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ রোধ এবং প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষ ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সুশাসন, সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার পিপিপি বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বেসরকারি খাতের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যেন আবার একটি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সেদিকেও সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ জন্য স্বচ্ছ ও উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা সংবলিত আইনি কাঠামো [৯] থাকতে হবে । সর্বোপরি, তিন মাস পর পর বাজেটের সার্বিক অগ্রগতি সংসদকে জানানোর জন্য যে নতুন বিধান সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা বিল - ২০০৯ এর কার্যকারিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ।

১৭ জুন ২০০৯, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ৯১৪৫৬০০, ফ্যাক্সঃ ৯১৩৯৭৯০ ই-মেইলঃ info@supro.org, ওয়েব: www.supro.org

*** আলোচনাপত্রটি তৈরি করেছেন- লরেন্স বেসরা, বাসন্তি সাহা, আলিম আল রাজী, ইকবাল উদ্দিন ও কাজী শফিকুর রহমান**

[৯] সুশাসনের স্বাক্ষর রাখিতে পারিলেই বাজেট সফল হইবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুন, ২০০৯